ড. মিল্টন বিশ্বাস
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফোকলোরের পদ্ধতি

৪.১ ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি

কাহিনীগত সাদৃশ্য লোককথা-চর্চার ক্ষেত্রে-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয়। অ্যাক্সেল ওলরিক নির্দেশিত লোককাহিনীর ধ্রুপদী বিধিকে স্টিথ থম্পসন যেভাবে বিশ্বজনীন ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন, তার মাধ্যমে লোকথার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলো যে বিভিন্ন দেশেই সমান, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা শত শতাব্দীতেই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। গ্রিম ভাইদের কাহিনীর সংকলন প্রকাশিত হবার পর জোহান্নেস বোল্ট ও গিয়র্গ পলিভ্কা একটি বিস্তৃত তুলনামূলক কাহিনীসূচি প্রস্তুত করেছিলেন, যার মাধ্যমে এই ছকের কাহিনীর সামান্য হেরফের নিয়ে কেন যে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও অঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়, তা নিয়ে মতবাদ তৈরি করতে লাগলেন। পরিভ্রমণ এবং বহু উৎসজাত এই দুই চিন্তাধারারই সমন্বিতভাবে প্রতিফলন ঘটল এর মধ্যে।

এরই সমান্তরালভাবে গত শতাব্দীর শেষার্ধে জুলিয়াস ক্রোন লোককাহিনী বিচারের ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন। একই কাহিনীর বিভিন্ন পাঠ একই সংস্কৃতির এবং অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এবং পর্যায়ে পাওয়া যায়, ফোকলোর বিজ্ঞানে যার নাম 'আইকোটাইপ'। ঠিক অনুরূপভাবেই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রাপ্ত

অনুরূপ কাহিনীগুলোর মধ্যে কোনটি কার পূর্ববর্তী এবং কাহিনীগুলোর মধ্যে আদিমতম রূপ বা 'আর্কিটাইপ' কোনটি, যেমন এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়, অন্যদিকে আদিকাহিনী কীভাবে পরিবর্তন করতে করতে বাইরের রূপটুকু পাল্টেছে, তারও একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়।

এই পদ্ধতিতে একটি কাহিনীর যতগুলো সম্ভব পাঠ সংগ্রহ করে, ভাষা ও দেশগতভাবে তাদের বর্গীকরণ করা হয়। অবশেষে সেই পাঠগুলোকে এক-একটি সূচক চিহ্নে চিহ্নিত করা হয়। এসব বিভিন্ন পাঠ 'আইকোটাইপ' বা 'সমতুল্যরূপ' গল্প বলে কথিত। এরপর কাহিনীর উপবর্গে বিস্তৃত পাঠগুলোকে ভৌগোলিক বিন্যাস অনুযায়ী বিন্যস্ত করে অভ্যন্তরীণ তথ্যের সহায়তায় তাদের ইতিহাসগত পূর্ব পরম্পরাটি নির্ণয় করা হয়। এরপর প্রতিটি পাঠের অন্তর্গত খণ্ডাংশের জন্য একটি করে সূচকপত্র প্রস্তুত করতে হবে। এই সমস্ত খণ্ডাংশের সূচকপত্র তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য সাজিয়ে নিয়ে একটি সামূহিক কাহিনীরূপে তৈরি করা হয়, যার মধ্যে অবশিষ্ট নির্বিশেষে খণ্ডাংশগুলো সমন্বিত হয়েছে। ফলে বিচার্য যে কোনো কাহিনী পাঠের তুলনায় তার মধ্যে কাহিনী উপকরণ সংখ্যায় বেশি থাকতে বাধ্য। এই সামূহিক কাহিনী রূপের সঙ্গে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক যে পাঠটি মেলে, সেটিই কাহিনীর আদিপাঠ বলে স্বীকৃত হয়। অন্য পাঠগুলো তুলনীয় রূপের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে কাছাকাছি তাদের কাহিনীর খণ্ডাংশগুলোকে সংখ্যাগতভাবে গণনা করে আদির পরবর্তী স্তরের কাহিনীগুলোর ক্রম পর্যায়গত বিকাশধারা সন্ধান করা হয়।

বোল্ট-পলিভ্কার পদ্ধতির মধ্যে যে সমন্বয়ের ব্যাপারটা স্বীকৃত হলো, তার সঙ্গে ক্রোনের পদ্ধতির খানিকটা পার্থক্য তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক্রোন মোটামুটিভাবে পরিভ্রমণ তত্ত্বের উপরেই নির্ভরশীল, কিন্তু তাঁর পদ্ধতির একটা বড় অপূর্ণতা হচ্ছে এই যে, একটি বিশেষ কাহিনীর ইতিহাস ও ভৌগোলিক সীমানা খুঁজে বার করা ছাড়া এই পদ্ধতির উপকারিতা তেমন কিছু পাওয়া যায় না।

সংলগ্ন-সংস্কৃতিগুলোতে একই ধরনের কাহিনী পরিভ্রমণ করতে করতে উপস্থিত হয়েছে একটি মূল কাহিনীর দিকে, এটাই এই পদ্ধতির প্রধান প্রতিপাদ্য। বহু-উৎসজ সম্ভাবনার গল্প অর্থাৎ পরস্পর অসম্পৃক্ত সংস্কৃতির কাহিনী বিশ্লেষণ করতে এই পদ্ধতি সক্ষম নয়।

৪.২ নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি

আদিম সমাজের প্রথা-পদ্ধতি, বিশ্বাস-সংস্কার ইত্যাদি কীভাবে বিকশিত ও পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানকালে উন্নীত হয়েছে, তা পরীক্ষা করা হয় 'নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি'র (Anthropological Method) সাহায্যে।[৭৮]

সংস্কৃতির যে অংশ লোকজীবন সংশ্লিষ্ট ভাবাচরকে বিভিন্ন আঙ্গিক ও মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তাকে ফোকলোর বলা চলে। সংস্কৃতি যা কিনা নৃতত্ত্ব বিশেষভাবে সামাজিক নৃতত্ত্বের কেন্দ্রগ আলোচ্য বিষয়, তা কিন্তু যে সমাজকে সামনে রেখে অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয় তাকেও সাধারণভাবে লোকসমাজ বলে গ্রহণ করা চলে। এই

আলোকে দেখলে আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ ফোকলোরকে নৃতত্ত্বের বিষয় বললে অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃতির যে অংশ মুখের ভাষায় বিচিত্র শিল্পরূপ লাভ করেছে, আবহমানকাল ধরে পুরুষানুক্রমে প্রচার লাভ করে আসছে ফোকলোরের প্রাজ্ঞ গবেষকদের কাছে তা-ই মুখ্য আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত ছিল; কারণ, এ না হলে সীমা দখলের রেষারেষিতে বিষয়নিষ্ঠ গবেষকদের মধ্যে শরিকী সংঘর্ষের সম্ভাবান দেখা দিতে পারে। অবশ্য একথা খোলা মনে স্বীকার করে নেয়া ভালো যে নৃতত্ত্বের বিশেষ করে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের সীমা তথা আলোচ্য বিষয়, ফোকলোরের পরিধির থেকে অনেক ব্যাপক; এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে 'লোক' বলতে ফোকলোরবিদ তথা ফোকলোরস্টরা শুধুমাত্র গ্রামীণ জনসমাজকেই বোঝান না–এ্যালান ডাণ্ডিসের সূত্রাত্মক ভাষ্য মনে রেখে বলা চলে যে লোকসংস্কৃতির 'লোক' নগরজনের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া বিচিত্র নয়, যাইহোক একথা বুঝতে অসুবিধা হয়ে না যে দুটি বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ নৃতত্ত্ব ও ফোকলোরের মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই ক্ষেত্র নির্বাচন ও তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল রচনার ব্যাপারে এক ধরনের 'ওভারল্যাপিং' ঘটে যায় অর্থাৎ এক বিষয় অপর বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পর পরস্পরের নিজত্ব তথা বিশেষত্বকে হারিয়ে ফেলে। এ কথার সূত্র কিন্তু এ সিদ্ধান্তের দিকে যাওয়া ঠিক হবে না কে বিষয় গৌরবে ফোকলোর নৃতত্ত্বের থেকে ব্যাপক বা গুরুত্বপূর্ণ, অথবা মহত্ত্বপূর্ণ, বরং যুক্তিকে ভাবাবেগে না ভাসিয়ে দিলে একথা বলতে হয় যে ফোকলোর চর্চা নৃতত্ত্বচর্চার একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। অবশ্য কোনো নৃতাত্ত্বিক চর্চাই সম্পূর্ণ বা সর্বাঙ্গীন হতে পারে না যদি তা ফোকলোরগত উপাদান ও বিষয়বস্তুকে সচেতনভাবে গ্রহণ, চিন্তন এবং অধ্যয়নের বিষয় না করে। যাই হোক সমস্ত ব্যাপারটার তাত্ত্বিক অভিকেন্দ্রে 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রোজ্জ্বল উপস্থিতি ফোকলোর ও নৃতত্ত্বের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ ও অর্থময় করে তুলেছে। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের আলোচনায় সংস্কৃতিচর্চা অপরিহার্য লোকসংস্কৃতি তথা ফোকলোর গবেষণার ভরকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে সংস্কৃতির বিচিত্র তথা বর্ণময় পাদপ্রদীপের সামনে।

কালানুক্রমিক বিচারে ফোকলোর শব্দটি, উইলিয়ম টমাস চয়িত, নৃ-বিজ্ঞানী ই.বি. টাইলার প্রদত্ত 'সংস্কৃতি' শব্দটির পূর্বেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গুণগত বিচারে শব্দ দুটির অর্থোৎপত্তিতে পার্থক্যের তেমন কোনো সীমারেখা টানা যায় না। প্রসঙ্গত একথা বললে অস্বস্তির কারণ ঘটবে না যে ফোকলোর চর্চার পেছনে প্রাথমিক পর্বে যতখানি আবেগ এবং শিল্পানুরাগঋদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ততা বর্তমান ছিল, যতখানি মৌখিক ঐতিহ্যানুরাগনিষ্ঠ বিস্ময়তৎপর অস্থিরতা ছিল ঠিক ততখানি তাত্ত্বিকচেতনা তথা বৈজ্ঞানিক-সন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণী প্রতর্ক্যের সক্রিয় প্রচেষ্টা ছিল না, ফল ঃ ফোকলোর চর্চার ঐতিহ্য যতখানি রসনিষ্ঠ হয়েছে ততখানি বিজ্ঞান অন্বিষ্ট হারে উঠতে পারেনি। পক্ষান্তরে নৃ-বিজ্ঞান তথ্যে ও তত্ত্বে, ক্ষেত্রানুসন্ধানের ব্যাপকতায় ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা গবেষণায় সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিষয়রূপে পরিগণিত হয়েছে। নৃ-বিজ্ঞানীরা মানবধর্মী তথা মানবসমাজধর্মী ভাবনা-চেতনা, আচার-অনুষ্ঠানের অপার রহস্য উন্মোচন করে চলেছেন অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণের বহুমুখী যুক্তি-তত্ত্ব ও তর্ক সমন্বিত সূত্রাদি প্রয়োগের

মাধ্যমে এবং আজ নৃ-বিজ্ঞানের যে স্ফটিক-স্বচ্ছ ও সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছে তার উপরই ফোকলোর একাডেমিক তথা বিশ্লেষণনিষ্ঠ সচেতন পঠন পাঠন স্পৃহা ও গবেষণা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যা অদূর ভবিষ্যতে এর স্বাতন্ত্রীকৃত গবেষণা পরিমণ্ডল রচনার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

বিষয়গৌরবে ফোকলোরের মৌখিক শিল্প ঐতিহ্য অন্যতম প্রধান আলোচ্য হলেও বর্তমান সময়ে ফোকলোর গবেষক তথা ফোকলোর প্রেমী প্রাজ্ঞজনের অনুসন্ধিৎসা, গবেষণাকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চাশা শব্দ-নিরপেক্ষ মনুষ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং স্বভাব ব্যবহারের নানা জটিল মাত্রাকে আলোচনার বিষয়ভুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে। প্রথিতযশা নৃ-বিজ্ঞানী শরৎচন্দ্র রায়ের উৎসাহবাণী ভারতবর্ষের মানুষ, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত, জীবনের সবকটি অবস্থাতেই ফোকলোরের স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় বাস করে–ফোকলোর গবেষণার উদ্যোগী তাত্ত্বিকদের সবিশেষ প্রভাবিত করেছে; ফোকলোরবিদগণ নৃ-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তাঁদের বিষয়কে তাঁদের আলোচনার পরিমণ্ডলকে, মৌখিক শিল্প-ঐতিহ্যের আঙ্গিনার গণ্ডি অতিক্রম করে, সমগ্র লোকসমাজের বৈষয়িক, ব্যবহারিক এবং নান্দনিক দিগন্তে সম্প্রসারিত করেছেন।

নৃ-বিজ্ঞানীদের গবেষণায় যে সমস্ত পদ্ধতি বা মতবাদ সংস্কৃতির বিচিত্রমুখী, প্রসারকামী স্বভাবকে বিশ্লেষণ করতে এবং বুঝতে সাহায্য করেছে, যেমন বিবর্তনবাদ, পরিব্যপ্তিবাদ, কার্যবাদ এবং সংগঠনবাদ ইত্যাদি ফোকলোরের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও এই সমস্ত মতবাদ সবিশেষ কার্যকর হয়েছে। তাছাড়া নৃবিজ্ঞান ভাবনাজাত আত্মবাদ, সর্বপ্রাণবাদ, মনাচেতনা, অথবা পূর্বপুরুষের পূজা, টোটেম-ট্যাবু ভাবনা, যাদু পুরোহিত চেতনা, অথবা দৃষ্টিভঙ্গিগত দ্বৈধতা লোকসমাজ সৃষ্ট ঐতিহ্যের যে সব এলাকাকে শুচি-অশুচি সর্বজনীন সঙ্কীর্ণ তথা পৌরাণিক-প্রান্তিক শিরোনামে চিহ্নিত করে ক্ষেত্রানুসন্ধানলব্ধ উপাত্ত বিশ্লেষণে সহায়তা করেছে, আলোচ্য ফোকলোরের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেরও ঐসব ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী ভাবনা-চেতনা এবং তত্ত্বসূত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

ফোকলোরের যেটুকু পর্যায় শব্দ-অনুষঙ্গ অনুস্যূত এবং যার আবেদন নান্দনিক সুষমামণ্ডিত তার মধ্যে এক ধরনের উপযোগিতা-অপহৃত আবেদন থেকে যায়। ফোকলোরের এই এলাকায় নৃ-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ পড়ে না। ফোকলোরের আবহমান স্বতঃস্ফূর্ততা একাধারে প্রাচীনের স্থিতিশীল দায়বদ্ধতা ও নবীনের সৃজন-বৈকল্যকে প্রশ্রয় দিয়ে এগিয়ে চলেছে অনাগত ভবিষ্যতের দিগন্তে, রক্ষা করে চলেছে লোকসমাজের স্থিতি, বৃদ্ধি করে চলেছে সংহতি তার অজস্র উপাদান বৈভবে যা ধরা পড়েছে গান-গল্প, গীতিকা, পুরাকথা, রূপকথা, ব্রতকথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, রীতি-নীতি, রেওয়াজ, আচার-সংস্কার-কুসংস্কার ইত্যাদির শব্দবন্ধ পরিকাঠামোয়; ফোকলোর পরিষেবার দায়িত্ব নিয়েও লোকসমাজকে করে চলেছে শিক্ষিত, বীক্ষিত ও দীক্ষিত এর অফুরান প্রাণ-সম্ভাবনার নিষ্যন্দী রসবিকিরণে। ফোকলোরের এই অঞ্চলের অনেকখানি জুড়ে মৌখিক ঐতিহ্যের স্বরাট-এর মধ্যে শিল্প চাতুর্যের অবকাশ থেকে যায়; ফোকলোরের এই এলাকায় শিল্পী-সাহিত্যিক এবং রসবেত্তা সমালোচকদের সাগ্রহ

অন্বেষা লক্ষ্য করা যায়– অবশ্য এঁরাও ফোকলোরের শব্দ মাধ্যমে ঐতিহ্যকে তথা শব্দ-অতিরিক্ত ব্যবহার বিন্যাসকে যথাসম্ভব বিবর্তন, পরিব্যাপ্তি তথা তুলনাত্মক বিশ্লেষণের পরিপুষ্ট করে থাকেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথাও বলতে হয় যে, ফোকলোরের মৌখিক ঐতিহ্যকে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে সাহায্য করে নৃ-বিজ্ঞানীদের টেক্সট-কনটেক্সট অর্থাৎ শিল্প বিষয় এবং পারিপার্শ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্কজনিত অধ্যায়ন ও বিশ্লেষণ এবং এই অধ্যয়ন অবশ্যই ক্ষেত্রসমীক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েই। গল্পের চরিত্র, গানের বিষয়, ব্রতের বাঞ্ছা, কথার কামনা, গীতিকার ঐতিহ্যাচরণ এবং প্রবাদ-প্রহেলিকার রহস্য-ব্যঞ্জনা ইত্যাদি সবই বিশেষ বিশেষ লোকসমাজের আর্থ-সামাজিক দায় ও দায়িত্ববোধের নৃ-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় স্পষ্ট ও অর্থময় হয়।

আলোচনার সূত্রে এখানে মিথ বা পুরাকাহিনীর প্রসঙ্গ উঠতে পারে। যে কোনো আদিবাসী বা উপজাতি সমাজের অথবা লোকসমাজের পুরাকাহিনী বুঝতে গেলে সেই সমাজের কার্যবাদী ভূমিকাকে অধ্যয়ন তথা বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। পুরাকাহিনী পাঠ ও শ্রবণ প্রাক-স্বাক্ষর জনসমাজের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য–এই কাহিনী উক্ত সমাজকে দান করে নৈতিক ও চৈত্তিক জাজ, রক্ষা করে তথা বুদ্ধি করে সমাজ সংগঠনের দৃঢ়ভিত্তি ও অটুট কর্মক্ষমতা, কাজ করে সমাজের কর্মসাধনা ও আচার-অনুষ্ঠানের নিয়ামত শক্তিরূপে, স্ফূর্তিদান করে ঐতিহ্যাচারী রক্ষণশীল ভাব-ভাবনাকে যা দিয়ে সমাজ তার ঐহিক উন্নয়ন ও পারত্রিক ঋদ্ধির সম্ভাব্য ফলশ্রুতিতে বিশ্বস্ত থাকে। মিথকে প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী ম্যালিনস্কি মানবসভ্যতার প্রাণদ উপাদান বলেছেন, সোচ্চার হয়েছেন মিথের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্যাখ্যা করতে এই বলে যে যদিও মিথের মধ্যে যৌক্তিক পারম্পর্য নেই অথবা নেই শৈল্পিক রূপকল্পনার স্নিগ্ধ পর্যায়, তথাপি মিথকে আদিম জনসংগঠনের একান্ত অপরিহার্য সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে– মিথ হলে তাদের নীতিজ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসের সনদপত্র। ফোকলোরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পুরাকাহিনী বা মিথের এই যে কার্যবাদী ভূমিকা সমাজের স্থিতি ও সংহতি রক্ষায় তা নৃ-বিজ্ঞানীর সংস্কৃতির বিশ্লেষণের কার্যবাদী পদ্ধতির আলোকেই স্পষ্ট এবং অর্থময় হয়েছে। অনুরূপভাবে ফোকলোরের বিষয় উপ-বিষয়কে নৃ-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক-বিবর্তনবাদী আলোচনার আলোকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা যায়। পরিব্যাপ্তিবাদকে পাথেয় করে ফোকলোরের মৌখিক ও আচরিত পর্যায়কে তুলনাত্মক অধ্যয়ন দ্বারা পরিপুষ্ট করা যায়। তাই একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, নৃ-বিজ্ঞানে প্রচলিত প্রায় সব পদ্ধতিকে ফোকলোর চর্চায় ব্যবহার করতে হবে, কারণ ফোকলোর অনুশীলনকে বিজ্ঞানমনস্ক, প্রতর্ক্যনিষ্ঠ এবং অর্থময় হতে গেলে পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই হবে; এবং সে ক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞান অনুশীলন এবং নৃ-বিজ্ঞানে প্রচলিত তাত্ত্বিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে।

নৃ-বিজ্ঞান গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতালব্ধ সমাজবিষয়ের বস্তুনিচয় তথা সাংস্কৃতিক ব্যবহারকে শুধুমাত্র পরিচিতি করা এবং শ্রেণিকরণের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং তুলনাত্মক অধ্যয়ন করাই নয়, বরং পরিদৃশ্যমান সমাজ-সংস্কৃতির লক্ষণগুলোর বিভিন্নতার সূত্র ধরে এগুলোর আন্তর-স্বভাবগত যে ঐক্যময় অর্থনিষ্যন্দী

মৌলস্বভাব বর্তমান তার অনুসন্ধান করা– এই অনুসন্ধানই অর্থময় পদ্ধতি অর্থাৎ উন্নততর ব্যাখ্যাদান-সহায়ক পদ্ধতি নির্মাণে সফলকাম। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিজ্ঞতালব্ধ উপাত্তবিষয়ের আপাত দৃশ্যমান রূপ-বৈচিত্র্যে বিজ্ঞান বিভ্রান্ত না হয়ে অধীত সমাজ বিষয়ের বিভিন্ন এককের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সতত পরিবর্তনশীল চরিত্রকে বুঝতে সচেষ্ট হন এবং ঐ সূত্রে সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর সমবায়িক বিন্যাস যে সফটিক-কঠিন সম্ভাবনাপ্রসূ সমাজ-প্রত্যয় নির্মাণ করে তাকেও চিহ্নিত করেন, বা করতে পারেন। শুধুমাত্র কার্যবাদীভাব অথবা ভাগগুলোর বর্ণনা ও বিশ্লেষণে সামাজিক প্রত্যয়ের যথার্থ উপলব্ধি করা যায় না। নৃ-বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যবহৃত এই সংগঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দেখায় যে কোনো সমাজ ব্যবহার বা সাংস্কৃতিক উপাদান স্বতন্ত্রভাবে অবস্থানকালে অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলে প্রতিভাত হলে সম্মিলিত যৌগে তা সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে।

নৃ-বিজ্ঞানী ক্লৌদ লেভিস্ট্রাউস ভাষাবিজ্ঞানী রোমান জ্যাকবসন, লোকযানপণ্ডিত প্রপ, মনোবিজ্ঞানী পাইক, ফোকলোরের মহান গবেষক এ্যালান ডাণ্ডিস প্রমুখ সবাইই এ দিকটার উপর জোর দিয়েছেন এবং তাঁদের মননঋদ্ধ আলোচনায় নৃ-লোকবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন।

প্রত্যেক ভাষায় নিজস্ব সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার বাক্যগঠন রীতির পদ্ধতিতে যার মধ্যে রয়েছে ঐ ভাষার ধ্বনিরূপাত্মক বিশেষ বিন্যাস। ঐ ভাষায় রচিত কোনো গল্পকাহিনী, পুরকথা-রূপকথা, কাব্য-গীতিকা ইত্যাদি অন্য ভাষায় রূপান্তর লাভ করলে, বিষয় অপরিবর্তিত থাকলেও, উক্ত কাহিনীকে নতুন ভাষার নিজস্ব কাঠামোর রূপলাভ করতে হবে। বাক্য গঠনরীতি বিশেষ ভাষাভিত্তিক। যে কোনো মৌলিক ভাবনা দেশ-কালের মাত্রায় এবং বিশেষ ভাষার কাঠামোয় নানা বৈচিত্র্য অর্জন করলেও অর্থাৎ ব্যবহারকারী সমাজ-মানসের স্বেচ্ছা নির্বাচন প্রণালী অনুগ হলেও, বিশ্লেষণ তৎপরবিজ্ঞানী সৌৎসাহ-সনিধৎসা বিষয়ের এককগুলোর সামবায়িক বিন্যাসের মধ্যে থেকে মৌলিক ভাবনার চরিত্রকে চিহ্নিত করতে পারে।

প্রসঙ্গটির আর বিস্তার না ঘটিয়ে শুধু এটুকু বলা চলে যে, নৃ-বিজ্ঞান স্যসুর বা স্যসুরোত্তর ভাষা-বিজ্ঞান গবেষণা থেকে যে উন্নততর বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তা ফোকলোর গবেষণা পদ্ধতিকেও নৈপুণ্য দান করবে। এই সূত্রে চিহ্ন বিজ্ঞানের কথাও উঠবে। সে যাই হোক, গবেষণা কখনো থেমে থাকে না, তার চরিত্রই হলো পূর্ববর্তী পদ্ধতির সন্ধান করা। এ কারণেই প্রপ, এ্যালান ডাণ্ডিস প্রমুখ লোককাহিনীর বিশ্লেষণ গবেষণায় টমসন নির্দিষ্ট 'একক' অভিপ্রায় (motif) পর্যন্ত গিয়ে থেমে থাকেননি; প্রপ কাহিনীর পরিকাঠামোগত সংস্থান ফাভশান মুভ এবং টেল এই ছাঁচে বেঁধে দিয়েছেন। ফোকলোরবিদদের যে প্রশ্নে বা যে সমস্যায় দীর্ঘকালীন বাদানুবাদের আবর্তে ঘুরতে হয়েছে তা হলো ফোকলোরের সতত চলমান সৃজনশীল ধারাবাহিকতায় যা স্বতঃস্ফূর্ত হয় তা হলো বিষয়নিষ্ঠতার সামষ্টিক বিমূর্তন, ব্যাষ্টিক ক্ষমতা বা নৈপুণ্য অনেক ক্ষেত্রেই নিরুৎসাহিত হয়; কারণ ফোকলোরের সনাতনপন্থীরা ব্যাপারটাকে সাংস্কৃতিক মৌখিক উত্তরাধিকারের নামহীন সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা

করতে আগ্রহী। আলোচ্য বিষয়টিকে স্যসুরের স্বেচ্ছানির্বাচন নির্ভর ভাষাবিজ্ঞান সম্পৃক্ত চিহ্নদ্বয়–langue এবং parale যা উপভাষার মধ্যে ধরা পড়ে এর আলোকে দেখা যায়, অবশ্য ফোকলোরের আলোচনায় উক্ত চিহ্ন ধারণাকে মানুষের অর্থময় মৌখিক ও ব্যবহারিক স্বভাবের স্তর পর্যন্ত টেনে আনা চলে। লোককথাকে যার বিস্তার বিরাট ভুবন জুড়ে, সমষ্টি মালিকানার সম্পত্তি বলে মনে করা যায়। লোককথার যে অংশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রচারিত, ব্যক্তি শিল্পীর সৃষ্টিশীল নৈপুণ্যে অভিনব রূপলাবণ্যপ্রাপ্ত এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত অথবা লোকসঙ্গীতের যে অংশ গায়কের গায়কিতে বিশিষ্ট ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে ওঠে প্রচার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ লাভ করে অথবা লৌকিক দেব-দেবী সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের এলাকাভিত্তিক যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় ফুটে ওঠে, এমনকি দেব-দেবীদের রূপগুণগত স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয় তার সাক্ষ্যে এ কথা বলা চলে যে, লোকশিল্পী বা লোকশিল্পের ব্যাষ্টিক ও এলাকাভিত্তিক প্রকাশ–রূপের মধ্যে উদ্দিষ্ট যৌগের কাঠামোগত আদর্শের ধ্রুপদী আদল না থাকতে পারে কিন্তু তার দ্বারা একথা প্রমাণ হয় না যে, যে মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে যৌগের কাঠামো সৌষ্ঠবের আদর্শ রচিত হয়েছে ব্যক্তি শিল্পীর কুশলতাঋদ্ধ শিল্পরূপে সেই আদর্শের গুণগত চরিত্রের ব্যত্যয় ঘটবে। যে ধ্রুপদী রীতি মৌল এককের খণ্ডিত অংশগুলোকে আঙ্গিকসংস্থান দান করে, সেই রীতি নিয়ামত পদ্ধতিই লোক তাত্ত্বিকের অন্বিষ্ট আদর্শ। শিল্পের অবয়বীসত্তা শিল্পীর ব্যক্তিত্ব তথা স্পর্শ কাতর আবেগকে প্রকাশের সুযোগ দেয় যদিও সেগুলোর সঙ্গে শিল্পের আন্তঃকাঠামোর নাড়ির যোগ থেকে যায়। ভার্থেমে'র পরিভাষায় শিল্পের আন্তঃকাঠামো হলো সমাজ সত্যের প্রতিরূপ যা ব্যক্তি স্বরূপের ছোঁয়ায় প্রকাশরূপে বিশিষ্ট হয়।

ফোকলোর চর্চা নৃ-বিজ্ঞান গবেষণাকে নানাভাবে পুষ্ট করে চলেছে– শুধুমাত্র ব্যবহারিক প্রেক্ষিত সমাজের সবকিছু দায় ও সংস্কারকে অর্থময় করে তুলতে পারে না, মনুষ্য সমাজের যে মৌখিক নান্দনিক ধারাবাহিক ঐতিহ্য রয়েছে তার আলোকে অকথিত অনেক কাহিনী, অব্যাখ্যাত অনেক প্রশ্ন এবং অস্পষ্ট অনেক ইঙ্গিত স্পষ্ট হতে পারে। পক্ষান্তরে নৃ-বিজ্ঞান যা বর্তমান সময়ে ভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পদ্ধতি দ্বারা উৎসাহজনকভাবে প্রভাবিত, ফোকলোরের গবেষণাত্মক অনুশীলনকে অর্থময় অগ্রগতি দান করেছে, শুধুমাত্র ভাবাবেগও বিস্ময় নয়, শীলিত কৌতূহল ও মননঋদ্ধ প্রশ্নকুলতার আলোকে নৃ-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিকচেতনা ফোকলোরের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক-বিবর্তনবাদী তথা সমান্তরাল বিবর্তনবাদী, পরিব্যাপ্তিবাদী তথা কার্যবাদী ভূমিকাকে প্রয়োগ করে চলেছে–সর্বোপরি সংগঠনবাদী নৃ-বিজ্ঞান যা চিহ্ন বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দিচ্ছে, ফোকলোর গবেষককে লোকবিজ্ঞান চর্চার ভিত্তিমূল হিসেবে চিহ্নিত করতে পারছে।[৭৯] ভবিষ্যতের ফোকলোর গবেষণা যত বেশি নৃ-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পরিকাঠামো ব্যবহার করবে তত বেশি অনুশীলন শৃঙ্খলাকে আয়ত্ত করতে পারবে।

৪.৩ রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি

রুশ দেশীয় লোকবিজ্ঞানী ভ্লাদিমির প্রপ্ লোককথা বিচারের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি নিয়ে এলেন, সেটি হলো রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে কাহিনীর বহিরাঙ্গিক রূপের আড়ালে যে প্রচ্ছন্ন রূপটি থাকে, সেটিই বিচার্য বিষয়।

প্রপের পদ্ধতির মূল ভিত্তিভূমি হলো কাহিনীর সক্রিয় মূল এককগুলোর স্বরূপ বিচার করে তাদের মাধ্যমে কাহিনীর রূপগত পরিচয়কে নির্দেশ করা। প্রপ মূলত যে পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেটি-ভাষাতত্ত্বের একান্ত নিজস্ব রীতি। ভাষাবিদরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন ভাষারীতির অমিলগুলো বহিরাঙ্গিক অন্তলীনভাবে এরা কিছুসংখ্যক সুগঠিত নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীন। ফলে কয়েকটি সর্বজনীন সূত্রের ভিত্তিতে একটি ভাষা তার মৌলিক লক্ষণগুলো তৈরি করে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন দেশের লোককাহিনীগুলোতে সেই একই বহিরঙ্গিক অমিল এবং অন্তলীন মিল লক্ষ্য করা যায়। রাশিয়ান রূপকথাকে অবলম্বন করে ভ্লাদিমির প্রপ্ নিয়ে এলেন রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি। গঠনতত্ত্ব বিচার করতে গেলে একটি কাহিনীর দু-রকম পাঠের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়– আনুভূমিক এবং উল্লম্ব। আঙ্গিকের অপরিবর্তনীয়তা এবং কাহিনীর বিষয় বৈচিত্র্যের মধ্যে আপাতদ্বন্দ্বের সমস্যার নিরসন করার সময় কাহিনীর বিভিন্ন স্তরের অন্তর্গত উপাদানগুলো পরিবর্তনশীল, না অপরিবর্তনীয় সেটি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। পদ্ধতিটি প্রয়োগ্ করার সময় কাহিনীর অন্তলীন যে সমস্ত উপাদান-উপকরণ আছে, সেগুলোর সমতুল্য তা বিচার্য। যদি দেখা যায় যে, একাধিক কাহিনীর চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ ইত্যাদি পারস্পরিকভাবে তুলনাযোগ্য অবস্থায় আছে, তবে বলা যায় যে রূপতাত্ত্বিকভাবে কাহিনীগুলো সমধর্মী, কাহিনীর কাঠামোগত বিন্যাসকে অব্যাহত রেখে এই সমধর্মিতাকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

গঠনগত বিন্যাস বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেয়া হয় কাহিনী গঠনপদ্ধতি সাধারণ উপাদানকে। উপায় এবং প্রকৃতি যেরকমই হোক না কেন, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়টির সমতুল্যতার বিচারই হলো এক্ষেত্রে মুখ্য।

অ্যালান ডাণ্ডেস, প্রপের পদ্ধতিকে আরো একটু সফল করে নিয়েছেন। গঠন পদ্ধতির মূল উপাদান সক্রিয়মূল এককের দুটি দিককে তিনি গ্রহণ করেছেন–

কোনো কিছুর অনুপপত্তি [ল্যোক] এবং অনুপপত্তির বিমোচন [ল্যা লিকুইডেটেড]। এই পদ্ধতি রাশিয়ান রূপকথা ছাড়াও অন্যান্য সংস্কৃতির রূপকথাতেও এটি প্রযোজ্য হতে পারবে।[৮০]

৪.৪ আঙ্গিকবাদী পদ্ধতি

নোয়াম চমস্কি ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণে যেমন আঙ্গিকবাদী পদ্ধতির উদ্‌গাতা, তেমনি লোকপুরাণ বিচারের প্রসঙ্গে ফরাসি পণ্ডিত ক্লোদ-লেভিস্ত্রোস এই আঙ্গিকবাদী পদ্ধতিটিকে ফোকলোরেতেও নিয়ে আসেন। পরে পিয়ের মারান্দা, এলি কোঙ্গাস মারান্দা, অ্যালান ডাণ্ডেস প্রমুখ এই পদ্ধতি নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা ও রীতি নির্ণয় করেছেন। রূপতাত্ত্বিক পরিণতির অনিবার্য লব্ধ ফল হলো এই আঙ্গিকবাদী পদ্ধতি।

রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে যেমন শুধুমাত্র সক্রিয়মল এককগুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়, এই পদ্ধতিতে সক্রিয়মূল এককের সাথে সঙ্গে অন্যান্য উপাদানগুলোরও আঙ্গিকগত কাঠামোতে অবস্থিতির বিষয়ে সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির মতোই কাহিনীর চরিত্রগুলোর তুলনাযোগ্য কাজের নিরিখে কাহিনীগুলোর পারস্পরিক সমতুল্যতার বিচার করা হয়। কাহিনীগুলোর অন্তর্লীন কাঠামো সমান্তরাল হলে, আঙ্গিকগতভাবে কাহিনীগুলো তুলনাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কাহিনীর অভ্যন্তরীণ উপাদান উপকরণগুলো পারস্পরিকভাবে যে বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ, সেটাই হবে কাহিনী-কাঠামো। আঙ্গিকবাদী বিচার পদ্ধতিতে ঐ বিশেষ সম্পর্কগুলোকে প্রাথমিকভাবে বিচার করে উপকরণগুলোর গুরুত্ব পরম্পরাক্রমে স্থির করা হয়।

রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতিকারের কাহিনীর মৌল উপকরণ হিসেবে অপরিবর্তনীয় এবং পরিবর্তনশীল– এই যে দু'ধরনের শ্রেণিবিভাগ করেছিলেন, আঙ্গিকবাদী পদ্ধতিতেও সেই একই পন্থা গ্রহণীয়। তবে ফলগত বিবর্তনের [ডায়াক্রোনিক ডেভলপমেন্ট] তুলনায় কাল নিরপেক্ষ বিবর্তনকেই [সিনক্রোনিক] বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গাণিতিক জটিলতা। এই জটিলতার ভেতর থেকে আঙ্গিকবাদ পদ্ধতিকে সহজতর করে এনেছেন মারান্দা দম্পতি।

মারান্দা দম্পতি এককে দুটি পরস্পর বিপ্রতীপ, [বা, বাইনারী অপোজিটস] প্রকরণে বিচার করেছেন–ধনাত্মক [+] এবং ঋণত্মক [−] যদি × চরিত্র ঋণাত্মকভাবে আগাগোড়া সক্রিয় থাকে, তবে সে কাহিনীর নায়ক, যদি y চরিত্র ঋণাত্মকভাবে আগাগোড়া সমান সক্রিয় থাকে তবে সে প্রতিনায়ক। এই পদ্ধতি অনুসারে কাহিনীর সক্রিয়মূল এককগুলোকে দুটি প্রকরণে নিয়ে আসা হয়; ভালো = [+] এবং = [−] মন্দ এই সূচক ধরে অগ্রসর হতে হয়। এই সূচকের গতি-প্রকৃতি অনুসারেই গল্পের প্রকৃতি বোঝা যায়। তবু বলা যায় যে, মারান্দাদের সরলীকরণের পরেও এই পদ্ধতি বেশ জটিল।[৮১]

এই পদ্ধতিতে শিল্পবস্তুকে যদিও পুরোপুরিই জটিল গণিতে পরিণত করা হয়, তবুও তার রসানুভূতি নষ্ট হয় না। ভালো-মন্দ, শ্রেয়-আশ্রয় বিচার এই পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে করা যায় বলেই আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে শিল্পসাহিত্যের দায়িত্ব এর মাধ্যমে খর্ব হয় না।

৪.৫ ঐতিহাসিক-বস্তুবাদী পদ্ধতি

বিভিন্ন সামাজিক বর্গের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে যে সংঘাত শ্রেণিভিত্তিক সমাজে নিরন্তরভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, লোকসাহিত্যে–বিশেষত লোককথায় এবং প্রবাদে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। উৎপাদন-পদ্ধতির বদলের সঙ্গে-সঙ্গেই সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসেরও বদল হয়। এই শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে যে তত্ত্ব প্রতিতত্ত্ব-সমন্বিত-তত্ত্বের অবিরাম উদ্বর্তন চলে শ্রেণিসমাজে, তা-ই আবার লোকসাহিত্যে সামগ্রিকভাবে প্রতিফলিত হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে সেই প্রতিফলনকে বিশ্লেষিত করেছেন আজাদোভস্কি, সকোলভ প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা।

মর্গ্যানের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে ফ্রীড রুশ এঙ্গেলস তাঁর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন অরিজিন অব্য দা ফ্যামেলি, প্রাইভেট প্রপর্টি অ্যান্ড স্টেট গ্রন্থে সর্বপ্রথম, পরবর্তীকালে এই তত্ত্বের প্রেক্ষিতে সমাজের উদ্বর্তনের সঙ্গে সংস্কৃতি-বিবর্তনেরও নানাভাবে বিচার করা হয়েছে। অর্থনৈতিক শ্রেণিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-দু'ভাবেই লোকসাহিত্যে যে পড়েছে–এই বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে সেটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পুরাণবৃত্তে দেবাসুরের দ্বন্দ্বটি যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, তবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যাটি হলো ঃ সমুদ্রমন্থনের পর চুক্তিভঙ্গ করে অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে পালিয়ে গেল দেবতারা, আর নাগ-বাসুকীর বিষে জর্জর অসুরের দল শ্রমের শেষে ধুঁকতে লাগল বসে-বসে, শ্রমজীবী মানুষের মেহনতেই সভ্যতার সুধাভাণ্ড ভরে ওঠে, আর তার অধিকার বর্তায় দেবতা-রূপে সুপ্রতিষ্ঠ, ওপরতলার মানুষের হাতে; মেহনতের বিষে জর্জর হয়ে ধুঁকতে থাকে দেহশ্রমী অসুরের দল। শ্রমিক প্রমেথিউস অগ্নির অধিকার দাবি করেছিলেন বলে দেবরাজ জিউসের হাতে তাকে দশ হাজার বছরের পীড়ন সহ্য করতে হয়। এই শ্রেণি চেতনার সূত্রেই অনামা লোককথকরা, সারা পৃথিবীজুড়ে চিরকাল কাহিনীর শেষে যে বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত তাকে জেতান, শাস্তি দেন উৎপীড়কদের।

এ জন্যেই শয়তানি সুয়োরানী এবং ফাঁকনদাসীরা হেঁটে-কাঁটা-ওপরে-কাঁটা হয়ে মরে; রাক্ষস হয় রাজপুত্রের হাতে নিহত; সুখু যায় অজগরের পেটে, শিকারির হাতে নেকড়ের মরণ ঘটে; শঙ্খ কুমারের খড়গে সন্ন্যাসীর মাথা কাটা পড়ে; টুনটুনির নিবন্ধে রাজার নাক কাটা যায়।[৮২]

আঙ্গিকবাদীদের বাইনারী-আপোজিট-তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক-বস্তুবাদীদের থিসিস-অ্যান্টিথিসিসের তত্ত্বের মধ্যে কাল-নিরপেক্ষতা এবং কাল-সাপেক্ষতা সংক্রান্ত পার্থক্য থাকলেও, দ্বান্দ্বিকতার বিশ্লেষণে এ দুই সমতুল্য। সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শৃঙ্খলায় এই দুই তত্ত্বের যৌথ প্রয়োগ করার প্রয়াসও এখন চলছে।

৪.৬ কালানুক্রমিক ও কালানুগ পদ্ধতি

বর্তমানের ফোকলার গবেষণায় 'কালানুক্রমিক পদ্ধতি' (Diachronic Method) ও 'কালানুগ পদ্ধতি' (Synchronic Method) জনপ্রিয় হয়েছে। তুলনামূলক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে লৌকিক উপকরণের উৎস, উদ্ভব-কেন্দ্র, আদি পাঠ, অর্থ, নৃ-বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ইত্যাদি অনুসন্ধান করা হয়। এরূপ আলোচনা পদ্ধতিতে Diachronic Method বলা হয়। এতে ঐতিহাসিক ধারাক্রম অনুসরণ করা হয় বলে আমরা 'কালানুক্রমিক পদ্ধতি' পরিভাষাটি গ্রহণ করেছি।

আবার লৌকিক উপকরণের সমকালীন পাঠের (Oikotype) ওপর জোর দিয়ে ফোকলোর-এর গবেষণা পরিচালিত হয়। যে সময়ে ঐ উপকরণ সংগৃহীত হয়, সে সময়ের মানুষ, সমাজ, পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় আনা হয়। এ সূত্রে মূল পাঠের সঙ্গে প্রসঙ্গ অর্থাৎ Text-এর সঙ্গে context-এর কথাই ওঠে। সমকালের সংশ্লিষ্ট

সবকিছুকে আলোচনায় এলে ফোকলোর-এর মূল্যায়নকে synchronic method বলা হয়। এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'কালানুগ পদ্ধতি' গ্রহণ করা হয়েছে।

ফোকলোর একটি সার্বজনীন এবং জীবন্ত বিষয়। অতীতে জন্ম হলেও যুগে যুগে এর চর্চা হয়েছে। অনেককিছু মরে গেছে, আবার অনেককিছু টিকেও আছে। লৌকিক উপকরণের যেমন নান্দনিক দিক আছে, তেমনি সামাজিক উপযোগিতার দিকও আছে। এর কোনো একটা গুণ হারালে তা স্মৃতিচ্যুত হয়ে ঝরে পড়ে। যেসব উপকরণ বেঁচে থাকে সেসবও অক্ষত, অপরিবর্তিত থাকে না। স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশে অনেক ছড়া আছে, যার অভ্যন্তরে জাদুর ধর্ম আছে। শুরুতে জাদুর কারণে তার সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু পরে লৌকিক চেতনার পরিবর্তন ঘটলে প্রথাগত আচারের অথবা শিশুর খেলার ও চিত্তবিনোদনের ছড়ায় পরিণত হয়। এখন কুশপুত্তলিকা দাহ বিশ্বের একটি সর্বজনীন ব্যাপার। ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে কারও প্রতি বিরাগভাজন হলে বাঁশ-খড়-কাপড়-দড়ি দিয়ে তার প্রতিকৃতি তৈরি করে প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়। উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তিকে অপমান করা। অতীতে কুশপুত্তলিকা সম্পূর্ণ জাদুর বিষয় ছিল। শত্রুর প্রতিকৃতি তৈরি করে মন্ত্র পাঠ করে তার গায়ে আঘাত করা হতো, তাতে ঐ ব্যক্তির শরীরে প্রতিঘাতের সৃষ্টি হতো। আঘাতের মাত্রা অনুযায়ী সে কষ্ট ভোগ, এমনকি মৃত্যুও বরণ করত।

ফোকলোর চর্চার এসব গুণাগুণ বিচার করে এখন এর সমকালীনতা ও অতীতচারিতা উভয় প্রকার পাঠের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। সমাজের কোন উদ্দেশ্য সফল করে তোলে, তা জানার জন্য গবেষকগণ মূল পাঠ ও প্রসঙ্গেরও তুল্যমূল্য দিয়ে থাকেন। 'কালানুগ পদ্ধতি'র ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সি. ডব্লিউ, ভন সিডো 'আইকোটাইপ তত্ত্ব, প্রদান করেন। সংগ্রহকালীন পাঠকেই Oikotype বলা হয়।

ফোকলোর-এর উপকরণের আদিপাঠ আছে, পরিবর্তিত পাঠ-ও আছে। এ ধরনের পাঠের অনেক কথান্তর আছে। কালানুক্রমিক পদ্ধতির সাহায্যে এসব কথান্তর পর্যালোচনা করে তথ্যের মূল পাঠ, উৎস-কেন্দ্র, পরিভ্রমণের গতিবিধি ইত্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব হয়।[৮৩]